নব্য জাহেলিয়াতের মূর্তিঃ নারীবাদ

উস্তাদ ইয়াহিয়া আব্দুল হাফিজ

আধুনিক নব্য জাহেলিয়াতের কাঠামোকে যে দর্শনগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তার একটি হল ফেমিনিজম বা নারীবাদ। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারনৈতিকতার (লিবারেলিজম) পাশাপাশি নারীবাদকে এ সময়ের বড় একটি মূর্তি বলা ভুল হবে না।

আধুনিক মানুষের যে ফিতরাতি (প্রাকৃতিক) বিকৃতি ঘটেছে, ন্যায়-অন্যায়, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, সাদা-কালোর বিবেচনায় আজ যে ওলোটপালোট হয়েছে তার পেছনে নারীবাদের বড় ভূমিকা রয়েছে।

গত অর্ধ শতকে নারীবাদী দর্শন শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে মিডিয়া, উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যসূচী, রাজনীতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পলিসির উপর।

এসব অঙ্গনের চিন্তা, পদক্ষেপ, আদর্শসহ অনেক কিছুই প্রভাবিত হয়েছে নারীবাদের দর্শন দ্বারা। কিন্তু মুসলিমদের আলোচনায় নব্য জাহেলিয়াতের অন্যান্য মূর্তির তুলনায় এই মূর্তিটি অনেক সময়ই কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এই বিস্মৃত মূর্তি নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

প্রচলিত ইতিহাস

নারীবাদকে সাধারণত সংজ্ঞায়িত করা হয় নারীর অধিকার আদায়ের সামাজিক আন্দোলন হিসাবে। নারীবাদের প্রচলিত ইতিহাস আমাদের বলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে নারীবাদের প্রাথমিক ধারণাগুলো ইউরোপে আলোচিত হতে শুরু করে।

আধুনিক পশ্চিমের অন্যান্য দর্শনগুলোর মতোই এ ধারার সূচনাও

ঘটে তথাকথিত ‘এনলাইটেনমেন্ট’ (Enlightenment) দার্শনিকদের মাধ্যমে। গ্রীসে পশ্চিমা সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নারীকে অপূর্ণ মানুষ মনে করার যে প্রবণতা ছিল তারই ধারাবাহিকতা চলে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ এবং পরবর্তী ঔপনিবেশিক যুগে।

প্রাথমিক পর্যায়ে নারীবাদী চিন্তার পেছনে অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল এই কাঠামোগত ও নিয়মতান্ত্রিক যুলুমের প্রতিক্রিয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ধীরে ধীরে পশ্চিমা সমাজের বিভিন্ন সামাজিক বিধিবিধান ও আইনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে নারীবাদের সূচনা ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে।

এই সময়ে পশ্চিমের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর দৃশ্যমান প্রভাব ফেলতে শুরু করে নারীবাদ। এই সময়কালকে বলা হয়ে থাকে নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় (“First wave feminism”)।

প্রচলিত বয়ান অনুযায়ী এই পর্যায়ের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আইনগত দিক থেকে নারীর বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করা। বিশেষ করে ভোটাধিকার এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকার। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ের নারীবাদের মূল মনোযোগ ছিল কেবল শ্বেতাঙ্গ নারীর অধিকার নিয়ে।

নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (second wave) শুরু হয় ১৯৬০ এর দশকে। এই দশকে এসে অধিকার আদায়ের বদলে নারীবাদ মনোযোগ দেয় যৌন স্বাধীনতা (বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার অধিকার), প্রজননের অধিকার (গর্ভপাতের অধিকার ও বৈধতা),

কর্মক্ষেত্রে সমপ্রতিনিধিত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীবাদ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে মিডিয়া, রাজনৈতিক পলিসি এবং শিক্ষাঙ্গনকে। এই সময়কালে পাবলিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল ও সুশীলদের মাঝে নারীবাদী আদর্শ ছড়াতে শুরু করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীবাদ বিয়ে এবং পরিবারকে বিশেষভাবে নারীর বঞ্চনার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু বানায়।

এই সময়কালে নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে জাতিসঙ্ঘে গৃহীত হয় সিডও সনদ (CEDAW)। এই পর্যায় নারীবাদ পশ্চিমা সভ্যতার এক কর্তৃত্বশালী বয়ানে পরিণত হয়।

নারীবাদের তৃতীয় পর্যায়ের (Third wave) সূচনাকাল ধরা হয় গত নব্বইয়ের দশককে। এই পর্যায়ে নারীবাদ মনোযোগ দেয়, সমকামিতা (বিশেষ ভাবে নারীর মধ্যকার সমকামিতা/লেসবিয়ানিজম), রূপান্তরকামিতা (ট্রান্সজেন্ডারিজম), উভকামিতাসহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির স্বাধীনতা আর বৈষম্যের ক্রমকাঠামোর মতো বিভিন্ন বিষয়ে।

নতুন শতাব্দীতে নারীবাদী আলোচনাতে যুক্ত হয় উত্তরনারীবাদ (পোস্ট-ফেমিনিজম) এবং নারীবাদের চতুর্থ পর্যায় নামে আরও দুটি ধারা।

তবে নারীবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্ঘবদ্ধতার পর তৃতীয় পর্যায় থেকে নারীবাদ বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হতে শুরু করে। আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে পাঠ্যবই এবং মিডিয়ার মাধ্যমে নারীবাদি বিভিন্ন চিন্তা পৌঁছে যেতে শুরু করে ঘরে ঘরে।

উল্লেখ্য নারীবাদী আন্দোলন, গত দুই শতাব্দীর বিভিন্ন দর্শন দ্বারা নানানভাবে প্রভাবিত। বিশেষ করে মার্ক্সীয় চিন্তা এবং ফরাসী দার্শনিকদের উত্তরআধুনিক (পোস্টমর্ডান) চিন্তা নারীবাদের বিভিন্ন ধারাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে।

এই সকল বিষয়াদি আলোচনা করা সময়সাপেক্ষ এবং অপ্রয়োজনীয়। এখানে পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা কেবল সংক্ষিপ্ত একটি ছবি তুলে ধরলাম।

মুদ্রার অপর পিঠ

ইতিহাসের প্রচলিত বয়ানটিই পত্রিকা, প্রবন্ধ, মিডিয়া এবং বক্তব্যগুলোতে সাধারণত উঠে আসে। কিন্তু এই বয়ান অসম্পূর্ণ।

নারীবাদের প্রকৃত প্রভাব এবং হুমকি বুঝতে হলে কেবল অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসাবে নয়, নারীবাদকে দেখতে হবে সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে।

নারীবাদ সমাজে কী কী পরিবর্তন এনেছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। নারীবাদের এমন কিছু দিকের দিকে আমরা এখন তাকাবো।

পুরুষ ও পিতৃতন্ত্র :

নারীবাদ নারীর উপর চলা যুলুমের বিরুদ্ধে বলে। এতে আপত্তির কিছু নেই। নারীর উপর যুলুম হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু নারীবাদ এর জন্য দায়ী করে সমস্ত পুরুষ জাতিকে। শুধু তাই না, নারীবাদ বলে ঐতিহাসিকভাবে নারীকে বঞ্চিত ও অধীনস্ত করে রাখার জন্য পুরুষরা শোষণের এক কাঠামো তৈরি করেছে। এই কাঠামোকে তারা বলে পিতৃতন্ত্র (Patriarchy)।

পৃথিবীর ইতিহাস, সংস্কৃতি, শাসন, সভ্যতা সবই নাকি গড়ে উঠেছে

এই পিতৃতন্ত্রের কাঠামোর ভিতরে। এই কাঠামো ধ্বংস করার আগে নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব না। পিতৃতন্ত্রের কারণে সমগ্র পুরুষজাতি সুবিধাপ্রাপ্ত এবং সুবিধাবাদী। একইসাথে নারীবাদের পক্ষে অবস্থান না নেয়া প্রত্যেক পুরুষ একজন অত্যাচারী। নারীবাদ তাই আক্রমণ করে পুরুষকে এবং পুরুষত্বের ধারণাকে।

নারী ও পুরুষের সহজাত ভূমিকার বিরোধিতা :

নারীবাদ নারী ও পুরুষের ফিতরাতি (প্রাকৃতিক) বিভাজনকেও আক্রমণ করে। তারা নারী ও পুরুষের প্রাকৃতিক ভূমিকাকে উলটে দিতে চায়। আল্লাহ্ তা'আলা নারীর মধ্যে মাতা ও স্ত্রী হিসাবে সহজাত যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, এর উপযোগী হিসেবে তার অবস্থানের জন্য ঘরকে নিরাপদ স্থান নির্ধারণ করেছেন, নারীবাদের মতে সেটা পিতৃতন্ত্রের আবিষ্কার। পুরুষরাই শোষণ করার জন্য নারীদের ঘরে আঁটকে রেখেছে। আর এই কাজকে বৈধতা দেয়ার জন্য আবিষ্কার করেছে ধর্ম।

তাই নারীবাদ ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী।

পরিবারের উপর আক্রমণ :

নারীবাদ আক্রমণ করে পরিবারকে। নারীবাদের চোখে বিয়ে হল নারীর দাসত্ব। পরিবার হল নারীর কারাগার। পরিবার তাকে বন্দী করে রাখে। শিকল পরিয়ে রাখে তার স্বপ্ন, প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে। নারীকে মুক্ত হতে হলে পরিবারে মা ও স্ত্রী হিসাবে তার ভূমিকা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

ষাটের দশকের বিখ্যাত নারীবাদী বেটি ফ্রিডেনের মতে পরিবার হল নারীর জন্য 'এক আরামদায়ক বন্দিশালা'। নারীকে মুক্ত করতে হলে খাঁচা ভাঙ্গতে হবে। ঘর থেকে বের করে আনতে হবে।

জিনা ও বহুগামিতা :

বিয়ে এবং পরিবারের উপর আক্রমনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে নারীবাদের আরেক বিষাক্ত দিক। জিনা ও ব্যাভিচারের পক্ষে অবস্থান। নারীবাদ যৌনতার অধিকারের কথা বলে।

সোজা বাংলায় যার অর্থ হল, 'আমি আমার পছন্দমতো জিনা করবো। সমাজ কিংবা রাষ্ট্র আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আমার কাজকে বেআইনি কিংবা অনৈতিক বলতে পারবে না। যৌনতাকে কেন বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে?বিয়ে আর পরিবার তো পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো!'

যদি সমাজ কিংবা রাষ্ট্র জিনা করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা এর সমালোচনা করে তাহলে সেটা হবে নারীর যৌন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এভাবে অধিকার আর স্বাধীনতার কথা বলে নারীবাদ জিনার পক্ষে এক ধরনের নৈতিক কাঠামো তৈরি করে। বহুগামিতাকে উৎসাহিত করে।

গর্ভপাত :

একই সাথে নারীবাদ 'প্রজনন অধিকার' এর কথা বলে। নারীবাদ বলে নারীর নিজ দেহের উপর তার অধিকার থাকা উচিৎ। কথাগুলো শুনতে ভালো। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা আসলে বুঝায় যে, একজন নারী যেমন তার ইচ্ছে মতো জিনা করতে পারবে তেমনি সেই জিনার ফসল হিসাবে গর্ভে আসা সন্তানকেও ইচ্ছামতো গর্ভপাত করে হত্যা করতে পারবে।

আমেরিকায় এবং ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের ফসল হিসাবে তৈরি হয়েছে এমন অনেক এনজিও যারা গর্ভপাতকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং সহজলভ্য করে তুলেছে।

সমকামিতা ও যৌন বিকৃতি :

নারীবাদ, জিনার অধিকারের পাশাপাশি সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌনবিকৃতির পক্ষেও অবস্থান নেয়। যেহেতু পরিবার একটি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো তাই যৌনতাকে নারী ও পুরুষের মাঝে সীমাবদ্ধ করাও নারীবাদের মতে একটি পিতৃতান্ত্রিক শোষনবাদী চিন্তা। যৌনতাকে মুক্ত হতে হবে। নারী নারীর সাথে, পুরুষ পুরুষের সাথে, উভয়ের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হবে।

আবার পুরুষত্বকে আক্রমণ করার অংশ হিসাবে নারীবাদ লৈঙ্গিক পরিচয়ের ধারণাও তৈরি করে। প্রশ্নবিদ্ধ করে নারীত্ব ও পুরুষত্বকে এবং অবস্থান নেয় হাল আমলের রূপান্তরকামী (ট্রান্সজেন্ডার) আন্দোলনের সাথে।

নারীবাদ মূলত নারীকে ঘর থেকে বের করে এনে, অবাধ যৌনতাকে বৈধতা দিয়ে, পরিবারকে নষ্ট করে, নারী ও পুরুষের সহজাত ভূমিকাকে আক্রমণ করে সমাজকে এক গভীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে।

নারী যখন তার সম্মান ও নিরাপত্তার স্থান পরিবার থেকে বের হয়ে আসে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে জিনা-ব্যাভিচার বৃদ্ধি পায়। ভাঙ্গন ধরে পরিবারে।দুর্বল হতে থাকে সমাজ। নতুন প্রজন্ম নিজ পরিচয়, নিজের মর্যাদা সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিয়ে বড় হয়। বাড়ে সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, অশ্লীলতা, ফাহিশা।

অর্থাৎ নারীবাদ যুলুম বন্ধের নামে শুরু হলেও এটি এমন একটি কাঠামো তৈরি করে যা সমাজকে আমূলভাবে বদলে দেয়। সমাজকে নিয়ে যায় অবক্ষয়ের পথে এবং নৈতিকতা থেকে বহু বহু দূরে। একজন অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিম সহজেই অনুভব করবেন যে,

নারীবাদ মূলত একটি শয়তানী আদর্শ। যা মানুষের প্রবৃত্তিকে মুক্ত করে দেয় এবং সভ্যতা ও সুবিবেচনাকে নষ্ট করে ফেলে।

নারীবাদ ও ইসলাম

সূচনাকাল থেকেই নারীবাদ ধর্মবিদ্বেষী একটি দর্শন। প্রথম পর্যায়ের নারীবাদীদের লেখায় ধর্মবিরোধী অসংখ্যা উক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই সময়কালে পশ্চিমা নারীবাদী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত বেগম রোকেয়ার লেখাতেও সেই একই ছাপ দেখা যায়। ধর্মের বিরুদ্ধে নারীবাদের অবস্থানের মূল কারণ হল নারীবাদ ধর্মকে দেখে পিতৃতন্ত্রের অংশ হিসাবে।

সেই সাথে নারীবাদ ধর্মকে মনে করে নারীর উপর পুরুষের শোষণ টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসাবে। কারণ, পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই নারীর উপর পুরুষকে কর্তৃত্ব দেয়। আর নারীবাদের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব না।

তবে সাধারণভাবে ধর্মবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামের ব্যাপারে নারীবাদের আপত্তি অধিকতর তীব্র। এর কারণ হল এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে নিজের লিবারেল পরিচয় তৈরির জন্য পাশ্চাত্য সচেতনভাবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে প্রাচ্যের (বিশেষ করে ইসলামের) বিপরীত হিসাবে।

অর্থাৎ পাশ্চাত্য তার ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) ও উদার (লিবারেল) পরিচয় গড়ে তুলেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, সমাজ, নৈতিকতা এবং ওপনিবেশিক মনোভাবের ছাঁচে। প্রাচ্য বিশেষ করে ইসলাম নারীর ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেয় পাশ্চাত্য সংজ্ঞা হিসাবে সেটাকেই নারীর শোষণ হিসাবে গ্রহণ করে। লিবারেল পাশ্চাত্যের মতে ইসলাম নারীকে বন্দী করে আর পাশ্চাত্য তাকে মুক্তি দেয়।

এ কারণেই আজও আফগানিস্তান কিংবা ইরাকে আক্রমণ করার সময় আমেরিকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারী অধিকারের কথা বলে। নিজেদের যুদ্ধকে বৈধতা দেয়ার সময় তারা বলে ইসলামি পশ্চাৎপদতা থেকে তারা এসব দেশের নারীদের মুক্ত করতে যাচ্ছে।

তাওহিদবাদী বা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডার জন্য তারা সবসময় এমন কোন হতভাগিনীর ছবি নিয়ে আসে, যে বোরকা খুলে উল্লাস করছে। বার্তাটা পরিষ্কার। বোরকা হল দাসত্ব। নিজের শরীরকে উন্মুক্ত করা হল স্বাধীনতা। মুজাহিদিন নারীকে বোরকা পরিয়ে 'বন্দী' করে। আমেরিকা তার পোশাক খুলে দিয়ে তাকে মুক্ত করে। ইসলামী শরীয়াহর বিরুদ্ধে প্রচারণায় তারা প্রথম যে কথাগুলো আনে তার একটি হল 'নারী অধিকার'।

এ কারণেই সৌদি আরবের কোন মুরতাদ নারী যখন ইসলাম ত্যাগ করে পরিবারের কাছ থেকে পালিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে আশ্রয় নেয় আর হাফপ্যান্ট পরে ছবি তুলে তখন তারা তাকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের বীর বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এই পশ্চিমারাই তাদের দেশগুলোতে আইন করে মুসলিম নারীদেরকে নিকাব পরা থেকে বিরত রাখে।

বাংলাদেশে নারীবাদের প্রভাব

ইসলামের বিরুদ্ধে মনস্তাতিক ও আদর্শিক যুদ্ধে পাশ্চাত্যের তূণীরে সবচেয়ে কার্যকরী ও বহুল ব্যবহৃত তীরগুলোর মধ্যে নারীবাদ অন্যতম। পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম ভূখন্ডগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পলিসি নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি অন্য যে কাজটি করে তা হল নারীবাদের আদর্শ প্রচার করা এবং নারীবাদী বিভিন্ন পলিসি বাস্তবায়ন করা। এর মধ্যে জাতিসংঘের গৃহীত ও প্রচারকৃত সিডও (CEDAW) সনদের বিষয়টি

পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও এবং মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো মুসলিমদেশগুলোতে নারীবাদী পলিসি ও আদর্শ প্রচারিত হয়। নারীদের ঘর থেকে বের করে আনা, ১৮ বছরের নিচে বিয়েকে বেআইনি করা, শরীয়াহ অনুযায়ী উত্তরাধিকারের বিধানকে বেআইনি করা, পাঠ্যসূচিতে নারীবাদী প্রবন্ধ প্রবেশ করানোর মতো বিভিন্ন কাজ চলে অবিরাম। সেই সাথে চলে মিডিয়ার মাধ্যমে সুকৌশলে নারীবাদী বিভিন্ন ধারণার প্রচার।

বাংলাদেশে সবচেয়ে কুখ্যাত নারীবাদীরা সরাসরি পশ্চিমা নারীবাদীদের অনুসরণ করে। যেমন বেগম রোকেয়ার লেখা নারীবাদের প্রথম পর্যায়ের ধারণাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। তসলিমা নাসরিন, সুলতানা কামাল, খুশি কবিররা নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তব্যগুলোই নানান রঙ মিশিয়ে তুলে ধরে। আর হাল আমলের শাহবাগী আর উইমেনচ্যাপ্টারের লোকেরা নারীবাদের তৃতীয় পর্যায়ের বিষগুলো বাংলাভাষায় তুলে ধরে।

কাজেই নারীবাদ সরাসরি আমাদের সমাজ ও দেশজ বাস্তবতাকে প্রভাবিত করেছে, করছে। এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নারীবাদী চিন্তার প্রভাবে বাংলাদেশে বিয়ে সংক্রান্ত আইন বদলেছে ('বাল্যবিবাহ বেআইনি হওয়া')। এর প্রভাব আমাদের সমাজেও পড়েছে।

নারীর ক্যারিয়ার থাকতে হবে, নইলে তার জীবন ব্যর্থ, একথা আজ অসংখ্য মুসলিম বিশ্বাস করে। অনেক ইসলামী দলের নেতা কর্মীরা আজ মনে করে মেয়ে যদি চাকরি না করে তাহলে সে পিছিয়ে পড়বে। আমাদের সমাজে জিনা-ব্যাভিচার ও ডিভোর্সের সংখ্যা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। নগ্নতা ও

অশ্লীলতাও বেড়েছে। এগুলোর পিছনে নারীবাদ একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম কারণ অবশ্যই।

উপসংহার

নারীবাদ এমন একটি আদর্শ, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এই আদর্শ মানুষকে এমন এক পথে নিয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত ঈমান নষ্ট করে ফেলে। সেই সাথে মানবসমাজের যে নিয়মাবলী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নারীবাদ তার সাথেও সাংঘর্ষিক।

নারীবাদের প্রসার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। সমাজে জিনা, ব্যাভিচার, নগ্নতা ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি করে। কারণ নারীবাদ মানুষের ফিতরাতের সাথে সাংঘর্ষিক। নারীবাদ নারীর সহজাত, ফিতরাতী পরিচয় ও ভূমিকাকে অস্বীকার করে নারীকে পুরুষে আদলে গড়তে চায়। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারী, পুরুষ এবং সমাজ। ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রজন্ম।

তবে আমরা এ কথাও স্বীকার করি যে, আমাদের সমাজে কুসংস্কার, বিদআত, অনৈসলামিক আচার-প্রথা এবং হিন্দু ধর্মীয় প্রভাবের কারণে এমন অনেক বিষয় চালু আছে, যার কারণে নারীর উপর যুলুম হয়। যতোদিন নারীর বিরুদ্ধে যুলুম সমাজে জিইয়ে থাকবে, এবং এগুলোকে সামাজিকভাবে বৈধতা দেয়া হবে ততোদিন সমাজে নারীবাদের প্রবেশের দরজা উন্মুক্তই থাকবে।

যুলুমের ফলে সৃষ্ট ব্যথা এবং ক্ষোভকে নারীবাদীরা কাজে লাগাবে। এই যুলুমের সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী নারীর হক্ব আদায় করা, এ ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করা, শরীয়াহর সীমার

বাইরে না যাওয়া এবং ইহসানের ভিত্তিতে আমাদের আচরণকে চালিত করা।

নারীর বিরুদ্ধে যুলুমের প্রাকৃতিক, সহজাত এবং শ্রেষ্ঠ ওষুধ হল ইসলাম।

আর নারীবাদ হল এমন এক বিষাক্ত রাসায়নিক ওষুধ, যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় এক দিকে রোগী মরতে বসবে, অন্যদিকে আরও দশটি নতুন অসুখ দেখা দেবে। তাই আমাদের সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সেই সাথে নারীবাদের বিষাক্ত আদর্শ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, সতর্ক হতে হবে এবং এর বাস্তবতা মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে হবে।